ধারাবাহিক রচনা

রামকৃষ্ণোপনিষদ

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখোচ্চারিত বাণী—'শিবজ্ঞানে জীবসেবা',—একটি মহামন্ত্র যা অধ্যাত্মজীবনের দিঙ্‌নির্ণয়কারীরূপে পূর্ব-প্রচলিত ও পরিচিত উপনিষদগুলিতে উল্লিখিত হয়নি। কথামৃতকার শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের চতুর্থ খণ্ডে লিখেছেন, ''দু-একটি কথা উচ্চারিত হইল, (ঠাকুরের মুখ থেকে)—যেন বেদবাক্য; যেন দৈববাণী, অথবা যেন 'অনাহত' শব্দের একটি দুটি ধ্বনি (শ্রোতাদের) কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।" রামকৃষ্ণদেব ভাবসমাহিত অবস্থায় অনন্ত ভাবসমুদ্র থেকে দু-একটি ভাব-রূপ মণিরত্ন তুলে এনে যখন বিতরণ করতেন, তখন এমনই মনে হত শ্রোতাদের, শ্রীম সেই কথা বলছেন। এরকমই একদিন ভাবস্থ অবস্থায় বলে উঠেছিলেন, ''জীবে দয়া নয়, দয়া করবার তুই কে, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।" কথাগুলি সেখানে উপস্থিত নরেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হয় এবং তাঁর চিন্তাজগতে এক অপূর্ব আলোকপাত করে। জগন্মাতার জগৎকল্যাণকারী যে-কাজের জন্য সপ্তর্ষিলোক থেকে রামকৃষ্ণদেব তাঁকে আহ্বান করে এনেছিলেন, তার যেন শুভারম্ভ ঘটালেন এই অভিনব মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে। শুধু তাঁর শ্রবণে নয়, প্রাণে যেন প্রোথিত করে দিলেন এই সাধনমন্ত্রটি। এটি ছিল নরেন্দ্রনাথের কাছে, বলা যেতে পারে 'শব্দব্রহ্ম', যা মুহূর্তে তাঁর অতিজাগতিক চেতনায় এক গভীর ও সুদূরপ্রসারী মর্মার্থ সহ আলোড়নের সৃষ্টি করল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ মনে মনে ভাবলেন, যদি ভগবান দিন দেন তবে এর কার্যকারিতা জগৎসমক্ষে প্রমাণ করে দেবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে দীক্ষামন্ত্র কী দিয়েছিলেন আমাদের জানা নেই, তবে যিনি অধ্যাত্মজগতেরই মানুষ, ধ্যানালোকেই যাঁর স্বাভাবিক স্থিতি, তাঁকে যে-দীক্ষামন্ত্রই গুরু দিন না কেন, তার দ্বারা স্বামীজীর মতন উচ্চ অধিকারীর ধর্মজীবন অধিকতর উন্নত হবে এমনটি ভাবার অবকাশ নেই এখানে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আমরা যেমনটি আশা করে থাকি। উপরন্তু, গুরুপ্রদত্ত যে-সিদ্ধমন্ত্রটির সহায়ে শিষ্য ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে চরমাবস্থা বা সমাধির আনন্দ পর্যন্ত প্রাপ্ত হতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বামীজীকে সে-পথেও যেতে দেননি, স্বামীজীর প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও। আবার যে-কর্মপথে তাঁর প্রবল অনীহা, তাতেই তাঁকে যুক্ত করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তবে এ-রহস্যসন্ধানে এ-প্রবন্ধ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের প্রাণে যে-নবমন্ত্রটি প্রবিষ্ট করে তাঁর ভাবসমুদ্রে উত্তাল

তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন, যা তাঁকে শ্রীগুরুর দেহাবসানের পর ছুটিয়ে বার করে এনেছিল ভারতপরিভ্রমণের পথে, পরবর্তীতে বিশ্বভ্রমণে, অগণিত মানুষকে বেদান্তের উচ্চ আত্মতত্ত্বের ভিত্তিতে সেবা-সাধনায় যুক্ত করে দিল, তার প্রামাণ্যতা ও যুক্তিসিদ্ধতার সন্ধানেই এই প্রবন্ধরচনা।

'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—এই শব্দ চারটির গৌরবময় ভবিষ্যৎ কার্যকারিতার যে-চিত্রটি স্বামী বিবেকানন্দের মানসনেত্রে ভেসে উঠেছিল, তার বাস্তবায়নে তিনি তাঁর পরবর্তী জীবন নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, ওই বীজাকার মন্ত্রটিকে তিনি বিশাল মহীরুহে পরিণত করে আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন এবং সর্বযুগের জন্য এক মহিমময় ধর্ম ও কর্মপথ প্রদর্শিত করেছেন, যার মধ্যে উচ্চ আত্মভাবনা, নৈতিকতা ও সামাজিক সমন্বয়ের প্রশস্ত এক সরণী যেন উন্মোচিত হতে পেরেছে। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রটি তাই জাতীয় জাগরণেরও মন্ত্র বটে। আমাদের বুঝতে হবে স্বামীজীর চিন্তা অনুসরণেই, 'জীব' ও 'শিব'—এই দুটি শব্দের প্রকৃত অর্থ কী, এর দ্যোতনা কত দূর বা কত গভীর এর তাৎপর্য, কালের প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা কতটা, জাতীয়ভাব থেকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণের সম্ভাবনা কতটা স্বীকৃত, উদারতার মাপকাঠিতে তার স্থাননির্ণয়, ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব, প্রচলিত হিন্দুধর্মকে কোন উচ্চতায় এটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে বা তার reorientation কীরকম, পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক জগৎ ও জীবনকে মেলাতে পেরেছে কি না। এসবেরই সুষ্ঠু উত্তর স্বামীজী খুঁজে পেয়েছিলেন এই দিব্যবাণীটির মধ্যে।

এই তত্ত্বটিকে কিন্তু 'জীব-শিব-বাদ'রূপে অভিহিত করা যাবে না। কারণ এটি কোনও 'বাদ' বা 'theory' নয়, যা contradicted হতে পারে। এটি সত্য, পরীক্ষিত বা প্রতিষ্ঠিত সত্য। স্বামীজী যে-রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মূল আদর্শ ছিল এই ভাবনাকে কেন্দ্র করেই, যার সত্যতা ও কার্যকারিতা বিশ্বের দরবারে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এই তত্ত্বে জ্ঞান ও কর্ম একযোগে মুক্তিমার্গ বলে স্বীকৃত। যদিও আচার্য শংকর 'জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়'কে মোক্ষের পরিপন্থীরূপে উপস্থাপনা করেছেন, কিন্তু গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।' —জনক, অশ্বপতি নিষ্কাম কর্ম করেই মুক্তি লাভ করেছেন। বলা বাহুল্য জ্ঞানযুক্ত কর্মই নিষ্কাম কর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সত্য প্রত্যক্ষ করেছেন যে মানুষ সচল ঈশ্বর। যদি মাটির প্রতিমা গড়ে তাতে চৈতন্য আরোপ করে তার সেবা-পূজা করা যায়, তবে জীবন্ত মানুষ, যার মধ্যে চৈতন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত, তাকে কেন ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা-পূজা করা যাবে না? এমন যুক্তিসংগত কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। স্বামীজীও গুরুর এই উচ্চভাবনাকে অনুসরণ করে বলেছেন, ''অজ্ঞেরা যাকে মানুষ বলে, আমরা তাকেই দেবতা বলি।'' যে-শিবচৈতন্য ঈশ্বরে, সেই রয়েছে জীবশরীরের আধারে, সেটিই দেহের সারবস্তু, যা দেহযন্ত্রকে চালায় বা সজীব রাখে। সুতরাং জীবকে শিবজ্ঞান ও সেই বোধ থেকে তার সেবা;—এটি কোনও আবেগ বা কল্পনাপ্রসূত নয়, এটি একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত, যা ঔপনিষদিক ভাবনাপুষ্ট।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবতারা মহামায়ার স্তবে বলছেন, 'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।' তার পরেই বলছেন, 'যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা' এবং মহামায়া যে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর চৈতন্যশক্তির বিস্তার ঘটাচ্ছেন জীবশরীর ও মনের ক্রিয়ায়, সেকথা বেশ স্পষ্টভাবেই দেবতারা এই অপরাজিতাস্তবে জানাচ্ছেন। সুতরাং সৃষ্টি মানেই সেই একক চৈতন্যশক্তির বিশ্ববিস্তার। এই সত্যের উপলব্ধিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর

তপশ্চর্যার অমৃতফল, যাতে ঈশ্বরদর্শনের সঙ্গে তাঁর জগদ্-ব্যাপ্তিত্বেরও প্রত্যক্ষ দর্শন হয়েছিল; দেখেছিলেন—মানুষ, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, কাঠপাথর, অন্নব্যঞ্জন—সর্ববস্তুতে সেই একই চৈতন্য ওতপ্রোত রয়েছে, তাঁর ভাষায় যেন সব 'জরে রয়েছে'।

এই 'বিশ্বরূপদর্শন' রামকৃষ্ণদেবকে এক নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে যুগসমস্যার সমাধানে, সর্ব মানবিক কল্যাণসাধনে এক নতুন ধর্মপথ আবিষ্কার ও প্রয়োগে যেন তৎপর করেছিল যদিও তা জগন্মাতারই অভিপ্রায় বলে তিনি মনে করতেন এবং এরই জন্য একদল শুদ্ধসত্ত্ব যুবক ভক্তের অন্বেষণে সেই মা কালীর কাছেই দরবার করেছেন এবং জগন্মাতাও সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ওইরূপ যুবকভক্তদের তাঁর কাছে অনতিবিলম্বেই এনে দিয়েছেন। এই যুবকবৃন্দের মধ্যে নরেন্দ্রনাথকেই তিনি বিশেষ স্থান দিয়েছেন বা দিতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু এই কারণেই নয় যে তিনি দৈববলে সপ্তর্ষিলোক থেকে তাঁকে আহ্বান করে এনেছেন; তিনি দেখেছিলেন লৌকিকস্তরেও চরিত্র বিকাশের মাপকাঠিতে মেধায়, মননে, বিচার-বিতর্কে, সাহসে, দার্ঢ্যে, উদারতা ও অনাসক্তিতে অন্যান্যদের অতিক্রম করে এক অনন্য উচ্চতায় যেন স্থিত করেছেন নরেন্দ্রনাথ নিজেকে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে নরেন্দ্রনাথই ছিলেন যোগ্যতমের নির্বাচন এবং সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের তাঁকে দিব্যস্পর্শে অনন্তের আভাস দেওয়া, তাঁকেই ঘটি-বাটি, চৌকাঠ প্রভৃতি জড়বস্তুতেও চৈতন্যের অবস্থান প্রত্যক্ষ করানো, তাঁর সঙ্গে নিজের আত্মিক একত্ব জ্ঞাপনে, 'তুইও যে আমিও সে'—এ-কথা জানানো। তাই সেই শ্রেষ্ঠতমের কাছেই নিজের তপস্যাজনিত সিদ্ধান্তবাক্যটি নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন—''জীবে দয়া নয়, দয়া করবার তুই কে? শিবজ্ঞানে জীবসেবা" এবং নরেন্দ্রনাথও অনায়াসেই তৎক্ষণাৎ ওই অল্পবয়সেই, এই বাক্যের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ও পরবর্তীতে এই তত্ত্বকেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিধান, শ্রেষ্ঠ কর্মবিধানরূপে,—মনুষ্যজীবনে দেবত্ব অর্জনের প্রশস্ত পথরূপে প্রয়োগ ও প্রমাণ করতে তৎপর হন, এবং এটিই বিবেকানন্দের 'কর্মে পরিণত বেদান্ত' নামে খ্যাতিলাভ করেছে বিশ্ব ইতিহাসে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একদিন মাস্টারমশাইকে (শ্রীম) জিজ্ঞাসা করলেন, এবার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি কী অর্থাৎ এবার অবতীর্ণ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন বিশেষ কর্ম সম্পাদন করেছেন বলে শ্রীম মনে করেন। শ্রীমকে নিরুত্তর দেখে নিজেই জানালেন যে শ্রীঠাকুর এবার জীবলোক ও শিবলোকের মধ্যে একটি সেতু রচনা করে গেছেন যাতে সাধারণ মানুষও অনায়াসে, সমাজসংসারের মধ্যে থেকেও, শিবসমীপে যেতে সমর্থ হয়।

এখন প্রশ্ন 'জীব' কে বা কী, 'শিব' বলতেই বা কী বুঝি? আপাতত 'জীব' বলতে শুধু মানুষকেই ধরছি। আর 'শিব'?—দেবতা, দেবাদিদেব না কি শুদ্ধ চৈতন্যসত্তা? পৌরাণিক কাহিনিতে তিনি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সদা ধ্যানতন্ময়, অন্য দেবতাদের মতন স্বর্গলোকের বাসিন্দা নন, তিনি শ্মশানবাসী, অথচ তিনি হিমালয়দুহিতা পার্বতী বা উমার পতি, সন্তানের পিতা। এসব গল্পকাহিনি যুগ যুগ ধরে আমাদের অর্থাৎ হিন্দু ভারতবাসীর মনকে এক সূত্রে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে যুক্তিবাদী বৈদান্তিক দার্শনিকরা বলেন, এসব কল্পনা বাদ দাও। তিনি জ্যোতির্ময় চৈতন্যসত্তা, সকল জীবের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট। স্বয়ং শিবাবতার আচার্য শংকর তাঁর 'ব্রহ্মনামাবলী'তে লিখেছেন, 'আত্মজ্যোতিঃ শিবোঽস্ম্যহম্'। আচার্য দেবতা-বিলাসী নন, তাঁর সর্বাত্মসাধনায় সাকার দেবতা-কল্পনার স্থান ছিল না, 'শিব'কে একজন দেবতা, বা দেবতাশ্রেষ্ঠ ভাবলেও

মনের কল্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সুতরাং আপামর শিবভক্তদের 'শিব' বলতে যে-বাঘছাল পরিহিত, কর্পূরশুভ্র, জটাজূট সমন্বিত ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, ধ্যানতন্ময়, যে-মানসচিত্রটি ভেসে ওঠে, শিবজ্ঞানে জীবসেবায় তার স্থান নেই, তাহলে 'শিবজ্ঞান' বলতে 'শিবচৈতন্য' বা শিবসত্তাকে বুঝতে হবে। নরেন্দ্রনাথ, যিনি হিন্দু পূজা-অর্চনায় আজন্ম লালিত, নিজগৃহে সাকার শিবলিঙ্গের পূজা দেখতে জন্মাবধি অভ্যস্ত, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ওই বাক্যটি শ্রবণমাত্রই তার অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করে তাকে জগতের ক্ষেত্রে কার্যকরী করার ইচ্ছায় ভগবানের কাছে সুদিনের প্রার্থনা করেন। এখানে কঠোপনিষদের মন্ত্রটি—'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ' আমাদের মনে পড়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষকে দেখতে বলেছেন 'শিব'রূপে, তার অর্থ এই—যে-শুদ্ধ চৈতন্যসত্তা বা পরমাত্মা, নির্গুণ, নিরাকার, সর্বব্যাপী, তারই অংশ বা প্রতিবিম্বরূপে মানুষকে দেখতে হবে, আর সেই জ্ঞান নিয়ে বা সেই দৃষ্টিতে তার সেবা করতে হবে। এই মানুষরূপ জীবটি কিন্তু সীমায়িত। তার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সহ যে-জড় শরীর তা স্থান-কালের সীমায় আবদ্ধ। মনুষ্যেতর জীবকুলের সঙ্গে আহার, নিদ্রা ও বংশবিস্তার ইত্যাদি শারীর ক্রিয়ায় সে সমানুপাতিক হলেও এবং তার মধ্যে কিছু নিম্নস্তরের মানসবৃত্তি—ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, লোভ, ক্রোধ, শত্রুতা বা এককথায় স্থূল ভোগবাসনার প্রকাশ ঘটলেও, সে কয়েকটি দিব্য গুণেরও অধিকারী, —যেমন প্রেম, প্রীতি, ত্যাগ, দয়া, দাক্ষিণ্য, শাস্ত্রীয় মেধা, সর্বোপরি অদৃশ্য, অনন্ত ঈশ্বরচেতনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ''মানুষ কি কম গা? সে অনন্তকে চিন্তা করতে পারে।'' কোনও কোনও পাশ্চাত্য দার্শনিক যেমন ডেকার্টের মতে ঈশ্বরের ধারণা মানুষের সহজাত ধারণা বা 'Innate idea'। এমন যে-উন্নত অথচ সীমায়িত শরীরধারী, হেয়-উপাদেয় গুণবিশিষ্ট 'মানুষ', তাকে শিববোধে সেবা করার অর্থ ঠিক কী বা কীরূপে তা সম্ভব? আমরা দেখেছি আমাদের সমাজে ধর্মীয় আচরণের অঙ্গ হিসাবে, কোনও কোনও বিশেষ শক্তি উপাসনায়—দুর্গা, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি পূজায় একটি কুমারী কন্যাকে দেবীর মতো সজ্জিত করে দেবীর প্রতীকরূপে যথাবিধি পূজা করার প্রচলন রয়েছে। এটি খুবই একটি উন্নত প্রথা নিঃসন্দেহে। জীবন্ত মানুষে দেবত্ব আরোপ করে তার পূজা—এটি আমাদের শাস্ত্রীয় ভাবনারই অন্তর্গত রূপে দেখা যেতে পারে—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। কিন্তু এই পূজার ক্ষেত্রে দেবীর বিগ্রহ ও কুমারী কন্যা উভয়ই অবয়ববিশিষ্ট। তাই স্থূল দৃষ্টিতেই 'তাদাত্ম্য' সম্পর্কটি বোধগম্য হয়। কিন্তু শিবজ্ঞানে জীবসেবার ক্ষেত্রে এই সহজবোধ্যতা নেই। সেখানে শিবসত্তা বা শুদ্ধচৈতন্যসত্তা ও মানবচৈতন্যের একত্ব ভাবনা বা ধারণা করে, তার সেবা। এটি খুবই abstract বা নৈর্ব্যক্তিক ধারণা। রূপের সীমা পেরিয়ে অরূপের অনুসন্ধান ও তাকে চিন্তা করা খুবই কঠিন যা দীর্ঘ অনুশীলন বা সাধনা সাপেক্ষ। আমি যদি আমার মধ্যে শিবসত্তার জ্ঞান লাভ না করি তবে অন্যকে সেই বোধে সেবা করা যাবে না, সেখানে সেব্যকে একজন মানুষ ভেবেই অগ্রসর হতে হবে তার অন্তর্লীন দিব্য আত্মার বা চৈতন্যের খোঁজ না করে, এবং সেক্ষেত্রে সেবা বা পূজা ব্যর্থ হবে। শিবসত্তা ও জীবসত্তার একত্ব দর্শন বা এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে আরূঢ় না হলে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—কথার কথাই থেকে যাবে। সেবকের নিজের আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ হতে হবে, তবেই সেব্যকে সেই উপলব্ধিতে তুলতে পারবে সেবার মাধ্যমে। সুতরাং এই মন্ত্রটির সাধন উভয়কেই উন্নত মার্গে স্থিত করে দেবে। আমাদের ঋষিরা তাই সর্বজ্ঞানের সোপানরূপে ঘোষণা করেছেন—'আত্মানং বিদ্ধি'—আত্মাকে জানো বা

নিজেকে জানো। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে নিষ্কামকর্ম, ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা মন, বুদ্ধি শুদ্ধ হলে, তখনই সে এইরূপ সেবাকাজে সমর্থ হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে আত্মজ্ঞানযুক্ত শুদ্ধচিত্তই 'জীব-শিব' তত্ত্বটি আয়ত্ত করতে পারবে। শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত সমাধিজাত এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রটিকে উপনিষদের অন্তর্গত চারটি মহাবাক্যের সমতুল্য বলেই গ্রহণ করা চলে। দেখতে গেলে এ-মহাবাক্যের মর্মোদ্ধারও সাধন সাপেক্ষ, এতে সেবক নিজলব্ধ জ্ঞানকে সেব্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে তাকেও অধ্যাত্মভাবে জাগ্রত করে দেবে। একেই স্বামীজী 'ধর্মদান' বলেছেন, যা অন্নদান, প্রাণদান ও বিদ্যাদানের থেকে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর, কারণ এই তিনটি দান মানুষের দুঃখ চিরকালের জন্য দূর করতে সক্ষম হয় না যা ধর্মদান বা আত্মজ্ঞানদান করতে সমর্থ।

শ্রীবুদ্ধদেবের মতেও ধর্মদান সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বলেছেন ''ধর্মের মিষ্টতা অন্যান্য সর্ব মিষ্টতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্মের আনন্দ অন্য সব আনন্দ থেকে শ্রেষ্ঠ, তৃষ্ণার বিনাশ ও সর্বদুঃখ বিজেতা।''

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুপ্রদত্ত অপূর্ব তত্ত্বটিকেই সম্প্রসারিত করেছেন—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই আদর্শের মাধ্যমে—যাতে একই সঙ্গে নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ সাধিত হবে। আমাদের কাছে এতদিন নিজ মুক্তি সাধনই ছিল ধর্মের শেষ কথা। সেই পরিচিত অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের ওই বাক্যবন্ধটি যেন এক ভাববিপ্লব সৃষ্টি করল। নিজ মুক্তিসাধনে সমাজের কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এতদিন ছিল, আত্মমুক্তি সাধনে কেউ সিদ্ধ হলে তাঁকে আশ্রয় করে কিছু মুমুক্ষু মানুষ একত্রিত হতেন এবং তাঁর আদিষ্ট একটি নির্দিষ্ট সাধনপদ্ধতিতে ব্রতী হতেন ও পরবর্তীতে শিষ্য-প্রশিষ্য সহ সেই ধর্মমতের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে অন্যান্য ধর্মমত ও পথের থেকে পার্থক্য রচনা করে গণ্ডিবদ্ধ ও সংকীর্ণ হয়ে পড়তেন। এইভাবেই আমাদের দেশে অজস্র বিবদমান ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-নব ভাবনাটির জন্ম দিলেন, সেটি এক universal বা সামান্য সত্য রূপেই প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হল এবং সবদেশের সবকালের সব মানুষের জন্য যেন এক সর্বজনীন ঋতপথ, ধর্মপথ উন্মুক্ত করে দিল।

আচার্য শংকর সর্বশাস্ত্রের সাররূপে যে-শ্লোকটি রচনা করেছিলেন, তাতে তিনটি অংশ রয়েছে—(ক) ব্রহ্ম সত্যং, (খ) জগন্মিথ্যা (গ) জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদের প্রথম অংশটি পূর্ণ স্বীকার করেও দ্বিতীয়টিতে একটু পরিবর্তন আনলেন। তাঁর উপলব্ধিতে জগতও সত্য, ঈশ্বরের লীলা হিসাবে। শুধু জ্ঞানীর নয়, তার থেকে এক ধাপ উঠে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি অবলম্বনে একথা প্রমাণ করলেন তিনি। আর যে-তৃতীয় অংশটি—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—আচার্য শংকর একে বৌদ্ধিক স্তরে আলোচনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, মানবজীবনে এ-তত্ত্বের কার্যকারিতা প্রমাণে তৎপর হননি বা তাঁর স্বল্পায়তন জীবনে তা করা সম্ভব হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এর ব্যাবহারিক দিকে আলোকপাত করলেন; ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এর প্রায়োগিক দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করলেন এবং তার মুক্তির পথটিকে প্রশস্ততর করে দিলেন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে। এসবই ওই বাণী, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র corollary বা তার থেকে নিঃসৃত সত্যরূপেই এসে যায়।

শ্রীচৈতন্যদেবের যে 'জীবে দয়া'র ধর্মাদর্শ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে যুগোপযোগী করলেন যুক্তিসংগতভাবেই : ''জীবে দয়া নয়, জীবে দয়া করবার তুই কে?...'' 'দয়া'র মধ্যে করুণা, অনুগ্রহের ভাব থাকে। কোনও ব্যক্তি অন্য কোনও ব্যক্তিকে অনুগ্রহ বা করুণা করতে পারে না; যিনি জীব-জগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই সেই

অধিকার আছে। সমশ্রেণির একজন আর একজনের প্রতি সেই অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না, কারণ উভয়ই এক ঈশ্বরেরই অধীন, সৃষ্ট একজন আর এক সৃষ্টজীবের অধীন নয়। তাছাড়া, দয়া-করুণা-অনুগ্রহ এইসব ভাবের মধ্যে থাকে প্রভুত্ববোধ, অহমিকার ভাব, যাকে সাধনার পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্তু সেবার মধ্যে নম্রতা, দীনতা, ভালবাসা ইত্যাদি ভাবের প্রকাশ হয়, যা সাধনপথে অগ্রসর করিয়ে দিতে পারে। দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বতন দুই অবতারপুরুষ—আচার্য শংকর ও শ্রীচৈতন্যদেবের পরিপূরক সাধনপথটি দেখিয়ে দিলেন। স্বামীজী যে তাঁকে 'অবতারবরিষ্ঠ' আখ্যা দিয়েছেন, তার মূল সমর্থন মেলে ঠাকুরের এসব গৌরবময় কর্মে।

এখন 'সেবা'র অর্থটিও যথাযথভাবে বুঝতে হবে। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' একটি কর্মপথ, ধর্মপথও বটে। 'সেবা' আধ্যাত্মিক অর্থে 'সাধনা'। সুতরাং সাধনার শর্তগুলি এতেও প্রযুক্ত হবে। সেবা হবে প্রেমপূর্ণ, নিষ্কাম বা ফলাসক্তিরহিত। যশোলাভ, বিত্তলাভ, স্বীকৃতি বা কোনওরূপ প্রতিদানের আশায় এটি ক্লিষ্ট হবে না। এই সেবা পূজারই নামান্তর। সেবার প্রকারান্তর আছে। প্রত্যক্ষভাবে শরীর ও মনের সেবাই প্রধান। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীনের জন্য অনুরূপ দান, কারও ক্ষেত্রে বিদ্যাদান, অসহায় ব্যাধিগ্রস্তদের কায়িক সেবাদান বা প্রাণদান; বিপথগামীকে নৈতিক ও ধর্মোপদেশ দানে ঈশ্বরের পথে চালনা করা বা ধর্মদান ইত্যাদি, আবার সকল প্রাণীর জন্য শুভচিন্তা বা কল্যাণ কামনাও সেবার মধ্যেই পড়ে। শ্রীশ্রীমাকে এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন, ''মা আপনি কি প্রার্থনা করেন?'' শ্রীমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, ''বলি, ঠাকুর জগতের কল্যাণ করো।''

আমরা গভীর মনন দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখব, তাঁর স্বল্পায়তন জীবনখানি যেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'রই জীবন্ত নিদর্শন। এখানে বলা অসংগত হবে না যে তাঁর জন্ম শিবজ্যোতি থেকে এবং শৈশবে যাত্রায় শিবসজ্জায় সজ্জিত হওয়া মাত্র শিবভাবে ভাবিত হয়ে তাঁর গভীর সমাধিমগ্নতা, যার দীর্ঘস্থায়িত্ব তাঁর পরিজনদের চিন্তার কারণ হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঈশ্বরদর্শনের জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়ে তিনি সফল হন জগন্মাতার কৃপায় এবং তখনই এই সত্যজ্ঞানে আরূঢ় হন যে এক সর্বব্যাপী চৈতন্যসত্তারই বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রকাশমাত্র এই জীব-জগতের সবকিছু। তাই বিদ্বেষ, বিরোধ নয়, প্রেম ও সমন্বয়ের পথেই জগতের কল্যাণ ও মানবমনের উত্তরণ। তাই ধর্ম-কর্মে দয়া, করুণা, অনুগ্রহ বা প্রভুত্বের কোনও অবকাশ নেই। আছে শুধু দীনতা, নম্রতা ও প্রেম-প্রীতি সহ নিঃস্বার্থ সেবা জীবে জীবে উপস্থিত চৈতন্যরূপী ঈশ্বরের। এই উদার, মহান বাণীরই প্রতিফলন তাঁর জীবনে ও কর্মে। আশৈশব তাঁর চরিত্রে সেবাভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। গৃহে অবরুদ্ধ প্রতিবেশিনীদের আনন্দ দিতে তাঁদের কাছে নৃত্যগীত-অভিনয়াদি করে আসতেন, অযাচিতভাবে কায়িক শ্রমদান করে তীর্থযাত্রী সাধুদের সন্তোষবিধান করেছেন নিঃস্বার্থভাবে, পিতার দেহাবসানে গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজার্চনার ভার নিয়েছেন, বিপন্ন মাতার শ্রমলাঘব করেছেন গৃহকাজে সাহায্য করে। পরবর্তী কালে দক্ষিণেশ্বরে ও কলকাতায় শীর্ণ শরীর নিয়ে অগণিত ভক্তবৃন্দের কল্যাণসাধনে সদা তৎপর থেকেছেন; মহাপ্রয়াণের পূর্বেও তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা উপেক্ষা করে সমীপাগত ভক্তসন্তানদের কাছে নিরন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গ করে, কখনও বা রসালাপে তাঁদের আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন নিজ সুখ-স্বার্থের কথা এতটুকুও না ভেবে, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ঐকান্তিক সরলতা, দীনতা ও নম্রতা সহ। কথামৃতের পাতায় পাতায় এসবেরই বর্ণনা আছে। সুতরাং 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' শুধু একটি বাক্য বা বাণী নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যাপিত ঈশ্বরীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি, তাঁর জীবনে রূপায়িত একটি মহামন্ত্র, একটি মহাবাক্য।